দৈনিক ইনকিলাব
25-MAR-2003
১৩ ... ৩

নতুন শিক্ষা কমিশন কিছু কথা

মাহমুদ জামাল

বিএনপি সরকার সবসময় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় থাকাকালে তারা শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করে দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিলো। ২০০১ সালে তাদের নেতৃত্বে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা আবারো শিক্ষার উন্নয়নে ব্রতী হয়েছে। এ লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা নামে নতুন পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা, মেয়েদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ, মেয়েদের উপবৃত্তি চালু, প্রাথমিক শিক্ষা ও এবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ও অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা প্রদানের মত শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা বিস্তারে বর্তমান জোট সরকারের এ সকল পদক্ষেপ দেশ-বিদেশে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। শিক্ষার উন্নয়নে এ সকল যুগান্তকারী পদক্ষেপের পাশাপাশি সরকার সম্প্রতি একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে দেশের শিক্ষা সমস্যার প্রতিবিধানে তৎপর হয়েছেন।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এদেশে বিরাজমান শিক্ষা সমস্যার অন্যতম কারণ যে এখানেই নিহিত তাতে সন্দেহ থাকার কথা নয়। বিভিন্ন সরকারের সময় বিভিন্ন আঙ্গিকে শিক্ষা কমিশন গঠন এবং রিপোর্ট প্রণীত হয়েছে। কিন্তু কোন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টই বাস্তবতার মুখ দেখেনি। ফলে বর্তমান সরকার সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রবীণ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান মিঞাকে চেয়ারম্যান করে ২৪ সদস্যের একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন। এই কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন– (২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, (৩) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, (৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. এস এম এ ফায়েজ, (৫) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান, (৬) প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. আলী মুর্তজা, (৭) শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম এ হাদী, (৮) উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. এম শমসের আলী, (৯) নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ভিসি ড. হাফিজ জি এ সিদ্দিকী, (১০) ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির ভিসি ড. ফজলুল মবিন চৌধুরী, (১১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ, (১২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, (১৩) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক জনাব আজিজ আহমদ চৌধুরী, (১৪) কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক জনাব আব্দুর রফিক, (১৫) বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদের সভাপতি প্রফেসর শহীদুল ইসলাম, (১৬) ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ প্রফেসর গিয়াসউদ্দিন আহমদ, (১৭) ভিকারুন্নিসা নূন স্কুলের অধ্যক্ষ, (১৮) হলিক্রস স্কুলের প্রিন্সিপাল, (১৯) মণিপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, (২০) বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব সেলিম ভূইয়া, (২১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব আব্দুল ওয়াহাব, (২২) জনাব ইয়াসমিন মুর্শেদ, (২৩) জনাবা সালমা খান ও (২৪) জনাব সর্দার আলী।

এই কমিশন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, ইসলামী সামাজিক মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমুন্নত রেখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক চাহিদার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সার্বিক পরিস্থিতি বিশদভাবে পর্যালোচনা করে একটি সুপারিশ ও কর্মসূচীর রূপরেখা চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করবে বলে জানা গেছে। এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে মহৎ। তাই এ বিষয়ে তেমন কোন কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু যেহেতু শিক্ষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংবিধানের মূলনীতি ও ইসলামী মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে তাই প্রশ্ন থেকে যায় বৈকি!

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের যে মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছে তা হলো :

৮.(১) সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার– এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(১.ক) সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।

(২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূল সূত্র হইবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না।

এছাড়া এই সংবিধানের অপর একটি ধারা মতে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম।

শুধু সাংবিধানিকই নয় বরং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্বও কম নয়। মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে সউদী আরবের পবিত্র নগরী মক্কায় ওআইসি এক শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ঐ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ সম্মেলন শেষে প্রণীত ঘোষণায় বলা হয় :

Believing the tenets of Islam which preach that the quest of knowledge is an obligation on all Muslims. We declare ourselves determined to co-operate in spreading education more widely and strengthening educational institutions until ignorance and illiteracy have been eradicated and to rake measures aimed towards the strengthening of Islamic education curricula and to encourage research and Ijtihad among Muslim thinkers and Ulema while expanding the modern science and technologies. We also pledge ourselves to co-ordinate our efforts in field of education and culture. So that we may draw on our religious and traditional sources in order to unite the Ummah. Consolidates its culture and strengthen its solidarity. Cleanse our societies of the manifestation of moral laxity deviation by inculcating moral virtues protecting our youth from ignorance and from exploitation of the material needs of some Muslims to alienate them from their religion.

Believing in the need to propagate the principles of Islam and the spread of its cultural glory through out the Islamic societies in the world as a whole and to emphasize its reach heritage. Its spiritual strength, moral values and laws conducive to progress, justice and prosperity. We are determined to co-operate to provide the human and material means to achieve these objectives. We also pledge to exert further efforts in various cultural fields to achieve raprochement in the thinking of the Muslims and to purify Islamic thought of all that may be alien or divisive.[৪০]

সম্মেলন পরবর্তী পর্যায়ে দেশে ফিরে প্রেসিডেন্ট জিয়া শিক্ষা সংস্কারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৮ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী প্রথমে আব্দুল বাতেন ও পরে কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বে তিনি শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। শিক্ষার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত দেশের প্রখ্যাত ৪০ জন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে গঠিত এই জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ পরিপূর্ণ শিক্ষানীতি প্রণয়ন সময়সাপেক্ষ বিবেচনায় একটি অন্তর্বর্তী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। সারাদেশের ব্যাপকসংখ্যক শিক্ষা সচেতন মানুষের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত এই শিক্ষানীতিতে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য পৃথক বেতন কমিশন গঠন, তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পদক ও পুরস্কার প্রদানের মত বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন ঘটানোর উদ্যোগ তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। কারণ কমিটি যে সকল লোকের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছিল তাদের দ্বারা ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়ন সম্ভব ছিলো না। তবে অন্তর্বর্তীকালীন এই শিক্ষানীতিতে যাই থাক না কেন শিক্ষা কারিকুলাম ও পাঠ্যক্রমে ইসলামী তাহজীব তামদ্দুনের উপস্থিতি এ সময়ের পাঠ্যপুস্তকে বিদ্যমান ছিলো যা নিঃসন্দেহে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ইসলামী শিক্ষার প্রতি আন্তরিকতার পরিচায়ক।

৯০% মুসলমানের এই বাংলাদেশে শিক্ষার ইসলামীকরণ সরকারের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়ের অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তাতে সন্দেহ নেই। এই দায়বদ্ধতায় শিক্ষার ইসলামীকরণ বা ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার প্রসারে ১৯৯১-৯৬ টার্মে ক্ষমতায় থাকাকালে বিএনপি সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী (বর্তমানে মাননীয় স্পীকার) ব্যারিস্টার মুহাম্মদ জমিরউদ্দিন সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন বিশেষত কারিকুলামকে ঢেলে সাজাবার জন্য ১৯৯৪ সালে একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। গঠিত ঐ টাস্ক ফোর্স শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। টাস্ক ফোর্স নতুনভাবে যে কারিকুলাম প্রণয়ন করে তাতে সংবিধানের উল্লিখিত মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে এখানে বলা হয় :

শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে নীচের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী অর্জন করতে হবে :

১. শিক্ষার্থীদের মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে।

২. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অন্তরে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা।

৩. শিক্ষার্থীর মনে ধর্মীয়, আত্মিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে মানবিক গুণাবলীর বিকাশসাধন অর্থাৎ সৎ, চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ আদর্শ মানুষ তৈরী করা।

সুতরাং সাংবিধানিক বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী শিক্ষাকে ঢেলে সাজাবার ইচ্ছা এবং প্রয়াস দুই-ই বিএনপি'র রয়েছে তা বিশ্বাস না করার কোন কারণ নেই। কিন্তু গোল বেধে যায় কমিটিকে নিয়ে। এবারও ২৪ সদস্যের যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তার অধিকাংশ সদস্যই পদাধিকারী হিসেবে কমিশনের সদস্যের দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া সংবিধানের আওতায় ইসলামী ধাঁচে শিক্ষাকে সাজাবার প্রয়াসের সাথে সম্পৃক্ত বা পরিচিত তেমন কোন ব্যক্তি এই কমিটিতে লক্ষ্য করা যায় না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ২০০০ সালে ইসলামী একাডেমী ক্যাম্ব্রিজের উদ্যোগে বাংলাদেশের স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য একটি স্টাডি পরিচালিত হয়। এই স্টাডি টীমে বাংলাদেশের পক্ষে সমন্বয়ক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ড. এ কে এম আজহারুল ইসলাম (বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামের ভিসি) ও অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান। বাংলাদেশে পরিচালিত তৎকালীন শিক্ষার অবস্থা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার আলোকে ব্যত্যয়সমূহ ঐ রিপোর্টে সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। বর্তমানে গঠিত শিক্ষা কমিশনে ঐ রিপোর্টটি যেমন কাজে আসতে পারে, তেমন নতুন আঙ্গিকে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রণয়নে উপরোক্ত শিক্ষাবিদগণ এবং আরও দু'একজন প্রখ্যাত ইসলামী শিক্ষাবিদ ও আলেম মূল্যবান ভূমিকা রাখতে পারেন তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং সাংবিধানিক মৌলনীতির আলোকে জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে হলে ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক যে শিক্ষানীতির প্রয়োজন তা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটিতে আগে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসীদের সমাহার ঘটাতে হবে। নইলে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে প্রণীত তাত্ত্বিক রিপোর্টটি হয়তো সমৃদ্ধই হবে, কিন্তু তা আবারো একটি পণ্ডশ্রম হিসেবে ইতিহাসের অংশ হয়েই রইবে: আর দশটা রিপোর্টের মত জাতির কোন প্রয়োজনে তা আর আসবে না।